Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর ভুমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ সালমা কায়সার

রোলঃ 216022391227

২৯ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর ভুমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: সালমা কায়সার

রোলঃ 216022391227

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামে নারীর ভুমিকা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা: সালমা কায়সার, আইডিঃ 216022391227 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে নারীর ভুমিকা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Salma kaisar

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

মোছা: সালমা কায়সার

আইডিঃ 216022391227

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা: 1

১ম অধ্যায় : ইসলামের পরিচয় 3

২য় অধ্যায়: 6

১ম পরিচ্ছেদ: ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা: 6

২য় পরিচ্ছেদ: ইসলাম পূর্ব যুগে এবং অন্যান্য ধর্মে নারীর অধিকার ও মর্যাদা.. 14

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর অবস্থান : 14

তৃতীয় অধ্যায়:ইসলামে নারী জাতির ভূমিকা 17

১ম পরিচ্ছেদ: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু " সাক্ষদানকারী প্রথম মানুষ –"নারী"! 17

২য় পরিচ্ছেদ : "শিশুমনে ঈমানের ভীত স্থাপনকারী হলো নারী! 20

৩য় পরিচ্ছেদ: দ্বীনের খেদমতে নারীদের প্রসারিত বাহু; 26

৪র্থ পরিচ্ছেদ: দ্বীনের প্রথম শহীদ -নারী! 28

৫ম পরিচ্ছেদ: দ্বীন প্রচারে – নারী: 30

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ: যুদ্ধে নারীর অবদান; 31

৭ম পরিচ্ছেদ: রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীর ভুমিকা 35

৮ম পরিচ্ছেদ: সমাজ সংস্কারে নারীর ভুমিকা 38

৯ম পরিচ্ছেদ: কুরআন ও সুন্নাহর পুনরুজ্জীবনে নারীর ভুমিকা 40

চতুর্থ অধ্যায়: নারীরা সমাজের অর্ধেক-বাকি অর্ধেকের জন্মদানকারী নারীরাই! 43

পরিশিষ্ট 44

ভুমিকা:

নারী সভ্যতার সুতিকাগার, পৃথিবীর মূল উপাদান ও পরিবারের প্রধান কারিগর। যুগে যুগে এই নারীই পরম মমতাময়ী মা কখনো স্নেহের বোন কখনো বা আদরের কন্যা আবার কখনো নির্ভরশীলতার অনুপম আধার প্রেমময়ী স্ত্রী। নারী শুধু পৃথিবীতে টিকে থাকার অনিবার্য একক নয়। এই পৃথিবীর স্থিতিশীলতা আর কল্যাণকর রূপায়ণের মূল চালিকাশক্তি হলো এই নারী জাতিই।। তাই জমিনের জন্য নারী জাতিকে বাদ দিয়ে যে পরিকল্পনা রচিত হবে, তা অনিবার্যভাবে হবে অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ ব্যর্থ এক পরিকল্পনা। নারীকে বাদ দিয়ে কেবল পুরুষের গঠিত কোনো মানবসমাজও ভিত্তিহীন, অগ্রহণযোগ্য।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লার বলেন,”

}يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا{

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক্ দাবী কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও । নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক । (সুরা নিসা-০১)

যুগে যুগে দ্বীনের ভিত স্থাপনে নারী এক অনবদ্য খুঁটির মতো।নারীদের ত্যাগ যুগে যুগে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।কিয়ামত পর্যন্ত নারীদের মর্যাদা এবং দ্বীনের খেদমতের নারীর আত্মত্যাগ টিকে থাকবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা এরশাদ করেন,

“আমি নর-নারী নির্বিশেষে কারও কাজই কখনো বিনষ্ট করব না ।(সূরা আলে ইমরান: ১৯৫)”

'পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যে ব্যক্তিই যথার্থ মুমিন অবস্থায় (অর্থাৎ ঈমানের সঙ্গে) কোনো নেক কাজ করবে, তাকে দুনিয়ার জীবনে পবিত্র জীবনযাপন করাব এবং

আখিরাতের জীবনেও তাকে দুনিয়ার জীবনের কাজের জন্য উত্তম বিনিময় দান করব।'(সূরা নাহল: ৯৭)

দ্বীনের জন্য কেবল পুরুষ সাহাবারা (রাদিআল্লাহু আনহুম) জুলুমের স্বীকার হয়েছেন তা নয় বরং নারীদের কুরবানী পুরুষদের চেয়ে কোনো অংশেই কম ছিলো না।

পুরুষ সাহাবাগণের সাথে মহিলা সাহাবাগণ শুধু অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও জুলুম- অত্যাচার সহ্য করেননি, বরং শাহাদাতের নাজরানা তারাই প্রথম পেশ করেছেন। সুমাইয়্যা (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন মক্কার কাফিররা তার ওপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চালায়। মক্কার উত্তপ্ত বালুর মধ্যে লোহার বর্ম পরিয়ে দুপুরের রোদে দাঁড় করিয়ে রাখত। তারপরও তিনি ইসলামের ওপর অটল থাকতেন। একদিন দুপুরের রোদে লোহার বর্ম পরিয়ে তপ্ত বালুর ওপর উপুড় করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। সুমাইয়্যা (রা) কে অত্যাচারিত হতে দেখে তিনি তাকে বললেন, 'ধৈর্য ধরো। জান্নাতই হবে তোমার ঠিকানা।' এত অত্যাচার করেও কাফেররা তৃপ্ত হয়নি। অবশেষে আবু জাহল সুমাইয়া রাদিআল্লাহু আনহার গোপনাঙ্গে বর্শা বিদ্ধ করে তাকে শহীদ করে দেয়।

দ্বীনের ক্ষেত্রে পুরুষদের মুরতাদ হবার দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে।যেমন উম্মে হাবিবা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহার স্বামী ওবায়দুল্লাহ বিন জাহশ ঈমান আনার পর কষ্ট স্বীকার করতে অপ্রস্তুত হবার কারনে খ্রিস্টান হয়ে যান।

অপরদিকে আয়িশাহ রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহা বলেন," আমরা এমন কোনো মুহাজির মহিলার কথা জানিনা যে ঈমান আনার পর মুরতাদ হয়েছে।" (গ্রন্থ রাসূল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহিলা সাহাবায়ে কিতাব- পৃষ্ঠা ১০)

১ম অধ্যায় : ইসলামের পরিচয়

ইসলাম আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা।

ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহর অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা ও তার নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা; বিনা দ্বিধায় তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তার দেওয়া বিধান অনুসারে জীবনযাপন করা।

আল্লাহ জাল্লা শানুহ তাঁর প্রিয় নবীর (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ ও তাঁর সম্পদকে সম্পূর্ণ করেছেন। আর সমগ্র মানব ও দানব জাতির জন্য ইসলামকেই একমাত্র ধর্ম বলে মনোনীত ও নির্বাচিত করেছেন।

তিনি বলেন,
অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ (নেয়ামত) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্মরূপে মনোনীত করলাম। (সূরা মায়েদাহ ৩ আয়াত)

ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম আল্লাহ তাআলার কাছে গৃহীত হবে না।
ইসলাম এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাই একমাত্র মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে। আখেরাতে নাজাত দিতে পারে।
তিনি অন্যত্র বলেন,
অর্থাৎ, কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনো তার নিকট হতে গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে। (সূরা আলে ইমরান ৮৫ আয়াত)।

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি।

১. আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসূল-এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা।

২. সলাত কায়িম করা।

৩. যাকাত আদায় করা।

৪. হাজ্জ সম্পাদন করা এবং

৫. রমযানের সিয়ামব্রত পালন করা (রোজা রাখা)।

মুসলিম ১/৫ হাঃ ১৬, আহমাদ ৬০২২, ৬৩০৯)

মহান আল্লাহ বলেন,

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মরো না। (সূরা আলে ইমরান ১০২ আয়াত)

একজন ব্যক্তি ইসলামকে পূর্ণাঙ্গরূপে মানে তা তখনই বলা হবে, যখন সে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামের অনুশাসনকে মেনে চলবে। নববী মানহাজের উপর অটল এবং অবিচল থাকবে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

"হে মুমিনগণ! তোমরা পুর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

(সুরা বাকারা-২০৮)

ঈসা (আ)-এর সাথীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন-

'আর যখন আমি হাওয়ারিদের ইঙ্গিত করেছিলাম, আমার ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আনো, তারা বলেছিল, আমরা ঈমান আনলাম এবং সাক্ষী থাকো আমরা মুসলিম।' (সুরা মায়েদা-১১১)

কুরআনুল কারীমের এসব ব্যাখ্যা থেকে এ সত্য একেবারেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রত্যেক পয়গম্বরের দ্বীন ছিল ইসলাম। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা এ ঘোষণা

দিয়েছেন, ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য।

মোটকথা, আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি দিয়ে আত্মসমর্পণ করা এবং সব ধরনের শিরক মুক্ত হয়ে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করার নামই ইসলাম।

২য় অধ্যায়:

১ম পরিচ্ছেদ: ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা:

ইসলামপূর্ব যুগে গৃহপালিত পশু, বাজারের পণ্যসামগ্রী আর নারীর মাঝে তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। নারীর সামাজিক স্বীকৃতি তো ছিলই না-বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও ছিলো অত্যন্ত ক্ষীণ।

তাদের জন্ম ছিল যেন পরিবার পরিজনের জন্য বোঝাস্বরুপ ।তাই কন্যাশিশুকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো! এমনই করুণ ঘটনা আল্লাহ কুরআনুল কারিমে উল্লেখ করে বলেন

, 'আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল'? (সূরা তাকভীর ৮-৯)।

যখন জাহিলিয়াতের কালো অন্ধকার ভেদ করে ইসলামের নতুন সূর্য উদিত হলো তখন যাত্রা করল এক নতুন সভ্যতার উদ্ভাসিত দিগন্ত !

নারী জাতির জন্য উদিত হলো একটি নতুন দিগন্ত, একটি নতুন নির্দেশনা, একটি নতুন পথ এবং এক বরকতময় বিপ্লব শুরু হলো ইসলামের হাতে ধরে। এ বিপ্লব ছিল ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত। শিক্ষা, চরিত্র, সভ্যতা, সংস্কৃতি, থেকে শুরু করে কোনো কিছুই বাদ দেয়নি এ আলোক যাত্রা।

নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলাম যে ভূমিকা রেখেছে, ইসলামের আগে পৃথিবীর বুকে কোনো ধর্ম বা সভ্যতা এভাবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি! ইসলাম ও মহানবি (সা.) বিশ্বব্যাপী নারী অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এক কালজয়ী আদর্শ স্থাপন করেছেন! মানব মন ও মানব সমাজে নারী প্রগতির গোড়াপত্তন করে এক বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছেন।

দূরীভূত করেছেন নারী-পুরুষের ভেদাভেদ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'আর যে, মুমিন পুরুষ অথবা নারী সৎকর্ম করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদের বেহিসাব রিজিক দেওয়া হবে।' (সূরা আল-মু'মিন : ৪০)।

ইসলাম নারীকে শুধু পুরুষের সমমর্যাদা নয়, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষ থেকে নারীকে অধিক মর্যাদা দিয়েছে। মা হিসাবে ইসলামে একজন নারীকে একজন পুরুষের চেয়ে তিনগুণ বেশি শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ও মর্যাদার অধিকারী করেছে।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার এক লোক মহানবি হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর দরবারে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশি অধিকারী কে? নবিজি (সা.) বললেন, 'তোমার মা'। ওই লোক জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি উত্তর দিলেন 'তোমার মা'। ওই লোক আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? এবারও তিনি উত্তর দিলেন 'তোমার মা'।
(বুখারী পর্ব ৭৮ অধ্যায় ২ হাদীস নং ৫৯৭১; মুসলিম ৪৫ অধ্যায় ১, হাঃ ২৫৪৮))

উকবা ইবনে আমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ যার তিনটি কন্যাসন্তান আছে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে এবং তাদেরকে যথাসাধ্য উত্তম পোশাকাদি দেয়, তারা তার জন্য দোযখ থেকে রক্ষাকারী প্রতিবন্ধক হবে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক।
এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে, 'তারা তোমাদের আবরণস্বরূপ আর তোমরা তাদের আবরণ।' (সূরা-২ বাকারা, আয়াত : ১৮৭)।
কুরআনে আরও বলা হয়েছে, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সদাচরণ করো।' (সূরা-৪ নিসা, আয়াত : ১৯)।

নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের ভূমিকা :

মানব সৃষ্টির প্রথম দিকে আল্লাহ তা'আলা আদি পিতা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর সহধর্মিনী হিসাবে তাঁরই বাম পাঁজরের একটি হাড় হ'তে আদি মাতা হাওয়া (আঃ)-কে সৃজন করেন। অতঃপর তাঁদের হ'তে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে

মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ‘হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হ’তে সৃষ্টি করেছি’ (হুজুরাত ১৩)।

মহান আল্লাহ এ বিশ্ব জগতে অসংখ্য মাখলূকাতের মধ্যে মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً-

‘আর আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে জলে ও স্থলে আরোহণ করিয়েছি এবং উত্তম বস্তুসমূহ প্রদান করেছি। আর আমি তাদেরকে আমার বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি’ (বনী ইসরাঈল ৭০)।

আল্লাহ তা‘আলা নারী-পুরুষ উভয়কেই সম্মান দিয়েছেন, পুরুষের থেকে নারীকে ভিন্ন ভাবে দেখেননি। বরং যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও উপেক্ষিত নারী সমাজকে পুরুষের সমমর্যাদা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিক মর্যাদা দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ‘স্ত্রীদেরও পুরুষদের উপর ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে’ (বাক্বারাহ ২২৮)।

ইসলাম নারীর প্রতি সকল প্রকার অত্যাচার, অবিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করতঃ নারীকে সর্বক্ষেত্রে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর যে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হ’ল-

(ক) বিবাহের মাধ্যমে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

জাহিলী যুগে বৈবাহিক ক্ষেত্রে নারীদের কোনরূপ অধিকার ছিল না। তারা শুধু পুরুষের ভোগের সামগ্রী ছিল। ইসলাম এহেন ঘৃণিত প্রথার মূলোৎপাটন করতঃ নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُوْلُوا-

'তবে যেসব নারী তোমাদের পসন্দ হয়, তাদের মধ্য থেকে দুই দুই, তিন তিন, চার চার জনকে বিবাহ কর। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশংকা জাগে যে, তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না। তাহ'লে একজন স্ত্রী গ্রহণ কর অথবা তোমাদের দাসীদেরকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ কর। অবিচার হ'তে বাঁচার জন্য এটাই অধিক সঠিক কাজ' (নিসা ৩)।

(খ) স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতায় নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের পসন্দমত স্বামী গ্রহণের কোন অধিকার ছিল না। যখন-তখন তাদেরকে পাত্রস্থ করা হ'ত। কিন্তু ইসলাম নারীকে স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে বলপূর্বক কোন নারীর স্বামী হ'তে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ 'হে পুরুষরা! তোমরা মহিলাদেরকে (স্বীয় স্বামী নির্বাচন করে) বিয়ে করাতে বাধা প্রদান করো না' (বাক্বারাহ ২৩২)।

হাদীছে এরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'স্বামীহীনা নারীর বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত দেওয়া যাবে না। কুমারীর বিবাহ তার সম্মতি ব্যতীত দেওয়া চলবে না। তারা (উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে

আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কুমারীর সম্মতি কিরূপে (নেওয়া যাবে)? উত্তরে তিনি বললেন, তার নীরবতাই সম্মতি'।(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৬।)

(গ) স্ত্রী হিসাবে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলাম পারিবারিক জীবনে নারীকে দিয়েছে তার ন্যায্য অধিকার। সংসার জীবনে নারী-পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক। কোন একজনের একক প্রচেষ্টায় সংসার জীবন পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ 'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক' (বাক্বারাহ ১৮৭)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম চরিত্রের অধিকারী, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে নিজ স্ত্রীদের কাছে উত্তম'।

(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩২৫২, সনদ ছহীহ।)

শুধু তাই নয় নবী করীম (ছাঃ) তাঁর বৈবাহিক জীবনে বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করে পুরুষদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, স্ত্রীর সম্মান ও অধিকার কিভাবে প্রদান করতে হবে। আর স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ 'তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করো' (নিসা ১৯)।

(ঘ) মোহর দানের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

ইসলাম নারীর মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর প্রদান অপরিহার্য করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মোহর দিয়ে দাও সন্তুষ্টির সাথে' (নিসা ৪)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে শর্তটি পূরণ করা সবচেয়ে যরূরী তাহ'ল ঐ শর্ত- যা দ্বারা তোমরা (স্ত্রীর) লজ্জাস্থান হালাল করো'। অর্থাৎ 'মোহর'।[বুখারী ও মুসলিম, বুলূগুল মারাম, হা/৯৮৯।]

(ঙ) সহবাসের ক্ষেত্রে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

সহবাসের ক্ষেত্রে নারীর শারীরিক কষ্টের বিষয়টি খেয়াল রেখে ঋতুস্রাব অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ বলেন,

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-َ

'হে রাসূল (ছাঃ)! লোকেরা আপনার নিকট মহিলাদের স্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এটা অশুচি জনিত কষ্টদায়ক বিষয়। অতএব তোমরা ঋতুস্রাব চলাকালীন মহিলাদের সাথে সহবাস থেকে বিরত থাক। তারা পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটে যেও না। যখন তারা (সম্পূর্ণরূপে) পবিত্র হবে তখন তোমরা তাদের কাছে যাও, যেভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হুকুম করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন' (বাক্বারাহ ২২২)।

পায়ুপথে সহবাস করা হারাম। তবে পুরুষরা স্ত্রীদের যৌনাঙ্গে যেদিক থেকে ইচ্ছা সহবাস করতে পারে। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। অতএব তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে শস্যক্ষেত্রে গমন কর' (বাক্বারাহ ২২৩)।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِيْ قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ-ْ

জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, ইহুদীরা বলত, পুরুষ যদি পশ্চাৎদিক হ'তে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে সঙ্গম করে তাহ'লে সন্তান ট্যারা হয়। (তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের উদ্দেশ্যে) কুরআন মাজীদের এ আয়াত
'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার' (বাক্বারাহ ২২৩)'। [বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৩; ইবনু মাজাহ)

- **চ: উত্তরাধিকারে নারীর অধিকার**

উত্তরাধিকারে নারীর অধিকারের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে পবিত্র কোরআন। যদি কোনো নারীর কোনো ভাই না থাকে তাহলে তিনি (একা হলে) পিতার ত্যাজ্য সমুদয় সম্পত্তির অর্ধেক পাবেন। আর যদি তারা দুই বোন বা ততধিক হন এবং কোনো ভাই না থাকে তাহলে তারা তাদের পিতা/মাতার সমুদয় সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবেন। যদি এক বোন এবং এক ভাই হয় তাহলে একজন ভাইয়ের অংশের অর্ধেক পাবেন একজন বোন। অর্থাৎ যদি কেউ এমতাবস্থায় মারা যায় যে তার এক পুত্র ও এক কন্যা (আর কোনো উত্তরাধিকারী নেই)। তাহলে সমুদয় সম্পত্তি তিন ভাগে ভাগ করে দুই ভাগ পাবে পুত্র আর এক ভাগ পাবে কন্যা। এক পুত্র ও দুই কন্যা থাকলে সমুদয় সম্পত্তি চার ভাগে ভাগ করে দুই ভাগ পাবেন পুত্র। আর বাকি দুই ভাগ পাবেন দুই কন্যা (প্রত্যেক কন্যা এক ভাগ করে)। পবিত্র কোরআনুল কারিমে এরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন: একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর সমান। আর যদি শুধু নারীই হয় দু-এর অধিক, তাহলে তাদের জন্যে ওই ত্যাজ্য মালের তিন ভাগের দুই ভাগ। আর যদি (কন্যা) একজনই হয় তাহলে সে জন্য অর্ধেক।' (সুরা নিসা: ১১)।

স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতেও রয়েছে নারীর অধিকার। খ্রিষ্টান ধর্মে পিতার মৃত্যুর পর যদি তার কোনো পুত্র সন্তান জীবিত থাকে তবে কন্যা পৈতৃক সম্পত্তি থেকে কিছুই পাবে না। এ বিষয়টি প্রচলিত বাইবেলে উল্লেখ আছে। পুত্র সন্তান দু'জন হলে বড় পুত্র পাবে ছোটজনের দিগুণ। পুত্র না থাকলে সমস্ত সম্পত্তি কন্যার। কন্যা না থাকলে (মৃতের) ভায়ের। ভাই না থাকলে নিকটাত্মীয়র। তবুও মৃত ব্যক্তির বিধাবা স্ত্রী কিছুই পাবে না। অথচ ইসলাম স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার খুব মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যদি কারো স্বামীর ইন্তিকাল হয় আর সে স্বামীর কোনো সন্তান না থাকে তাহলে স্বামীর সমূদয় সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবেন। আর যদি স্বামীর সন্তান থাকে তাহলে স্ত্রী পাবেন এক-অষ্টমাংশ (আট ভাগের এক ভাগ)। পবিত্র কোরআনুল কারিমে এরশাদ হয়েছে, 'স্ত্রীদের জন্য তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তাদের জন্য হবে ওই সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ।'। (সুরা নিসা: ১২)।

সন্তানদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতেও রয়েছে মায়ের অধিকার। মা জীবিত থাকা অবস্থায় সন্তানের ইন্তিকাল হলে সন্তানের যদি কোনো সন্তান-সন্ততি না থাকে তাহলে সেই

সন্তানের সম্পদের এক- তৃতীয়াংশ পাবেন মা। আর যদি মৃত সন্তানের কোনো সন্তান-সন্ততি থাকে তাহলে মা সেই (মৃত) সন্তানের সম্পত্তির একশষ্টমাংশ (ছয় ভাগে এক ভাগ) পাবেন। পবিত্র কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, 'মৃতের কোনো পুত্র থাকলে পিতা-মাতার প্রত্যেকের জন্য (সন্তানের) ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিশ হয়, তবে মাতা পাবেন তিন ভাগের এক ভাগ।'। (সুরা নিসা: ১১)।

এভাবেই ইসলাম সম্পত্তিতে ও উত্তরাধিকারে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

২য় পরিচ্ছেদ: ইসলাম পূর্ব যুগে এবং অন্যান্য ধর্মে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর অবস্থান :

ইসলাম পূর্ব যুগে নারী ছিল সবচেয়ে অবহেলিত, লাঞ্চিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত এবং অধিকার হারা জাতি। সে সময় নারীকে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বাজারের পণ্য হিসাবে গণ্য করা হ’ত। সেই সময়ে নারীদেরকে মানুষ হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হ’ত না এবং তাদের কোন সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এমনকি মানব জাতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সমাজে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও ছিল না। তাদের প্রতি খুবই কঠোর আচরণ করা হ’ত। সে যুগে নারীদেরকে মনে করা হ’ত দাসী এবং ভারবাহী পশু হিসাবে। যাদেরকে ক্রয়-বিক্রয় করা হ’ত। সে আমলে স্বামী যত খুশি স্ত্রী গ্রহণ করত এবং ইচ্ছা করলে তার স্ত্রীকে অপরের কাছে বিক্রি করে দিতে পারত কিংবা স্ত্রীকে দিয়েই কেউ ঋণ পরিশোধ করত। আবার কেউ উপহার হিসাবে কাউকে এমনিই দিয়ে দিত। তারা কন্যা সন্তান জন্মকে লজ্জাজনক মনে করে স্বীয় নিষ্পাপ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও কুণ্ঠিত হ’ত না। তাদের এমন বিবেক বর্জিত কর্ম সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا الْمَوْؤُوْدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، ‘আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল’? (তাকভীর ৮-৯)।

সেযুগে তারা পিতা-মাতা বা স্বামীর মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হ’ত। পিতৃহীনা সুন্দরী-ধনবতী বালিকার অভিভাবক যথাযথ মোহর দানে তাকে বিবাহ করতে সম্মত হ’ত না। আবার অন্যত্র বিবাহ দিতেও অসম্মতি প্রকাশ করত। সুন্দরী বাঁদী দ্বারা দেহ ব্যবসা করিয়ে অর্থ উপার্জন করা হ’ত। এ গর্হিত কাজ হ’তে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ‘আর তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদের যুবতী দাসীদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত হ’তে বাধ্য করবে না। যখন তারা পাপমুক্ত থাকতে চায়’ (নূর ৩৩)। উল্লিখিত যুগে একের অধিক নারী বিবাহ করে তাদের ন্যায্য পাওনা হ’তে বঞ্চিত করা হ’ত। তাদেরকে তালাক দিয়ে অন্যত্র স্বামী

গ্রহণের অবকাশও দেওয়া হ’ত না। এ জাতীয় অমানবিক ও অমানুষিক যুলুম অত্যাচার নারী জাতির উপর করা হ’ত।

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী :

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীদের অবস্থান নিম্নে তুলে ধরা হ’ল-

হিন্দু ধর্মে : নারীদেরকে বলী দেওয়া হ’ত এবং এ ধর্মে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এছাড়াও এ ধর্মে নারীরা পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। হিন্দু ধর্মে নারীদের অতীব হীন ও নীচু স্তরের প্রাণী মনে করা হ’ত। এ দিকে ইঙ্গিত করেই Professor India গ্রন্থে বলা হয়েছে, There is no creature more sinful than woman. Woman is burning fire. She is the sharpedge of the razor she is verily all there in a body. অর্থাৎ ‘নারীর ন্যায় এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী জগতে আর নেই। নারী প্রজ্বলিত অগ্নি স্বরূপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এই সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট’। নারীদের প্রতি ঘৃণাভরে বলা হয়েছে, Men should not love their অর্থাৎ ‘নারীদেরকে ভালবাসা পুরুষদের উচিৎ নয়’।

বৌদ্ধ ধর্মে : বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে সকল পাপের জন্য দায়ী করা হ’ত। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ওয়েষ্টমার্ক বলেন, Woman are of all the snares which the tempter has spead for man, the most dangerous; in woman are embodied all the powers of infatuation which blined the mind of the world. অর্থাৎ ‘মানুষের জন্য প্রলোভনের যতগুলি ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে, যা সমস্ত বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়’।

ইহুদী ধর্মে : এ ধর্মে নারীর প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘সতী নারীর চেয়ে পাপিষ্ট পুরুষও শতগুণে ভাল’।তারা নারীকে যাবতীয় পাপ ও মন্দের মূল কারণ হিসাবে গণ্য করেছে।

খৃষ্টান ধর্মে : খৃষ্টধর্ম মতে নারীরাই নরকের প্রবেশ দ্বার। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ'-এর অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 'Woman has no soul' 'নারীর কোন আত্মা নেই'।

চীন সভ্যতায় : চীন দেশের নারীদের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে জনৈকা চীনা নারী বলেন, 'মানব সমাজে নারীদের স্থান সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারীর মত নিকৃষ্ট আর কিছু নেই'।

গ্রীক সভ্যতায় : বিশ্বখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, 'Woman is the greates source of chaose and disruption in the world' 'নারী জগতে বিশৃংখল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস'।

রোম সভ্যতায় : রোম সভ্যতায় পরিবারের নেতা ও পরিচালক পিতা বা স্বামী নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তারা যখন ইচ্ছে তখনই নারীকে ঘর থেকে বহিষ্কার করে দিত।

তৃতীয় অধ্যায়:ইসলামে নারী জাতির ভূমিকা

১ম পরিচ্ছেদ: “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু “ সাক্ষদানকারী প্রথম মানুষ –“নারী”!

নবী করীম স-এর পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে খাদিজা (রা)-এর স্থান সর্বোচ্চ। তিনি তার প্রথম স্ত্রী।

খাদিজা (রা) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর সর্বপ্রথম ঈমান আনেন। ড. মু. হুসাইন হায়কল ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, যখন সূরা মুদ্দাসসির নাযিল হলো, তখন খাদিজা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'জিবরাঈল (আ) আল্লাহ তাআলার নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন। মানুষকে তার ইবাদত করার আহ্বান জানানোর জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। কিন্তু খাদিজা, আমি কীভাবে এই আহ্বান জানাবো? কে আমার এই আহ্বানে সাড়া দেবে?' এ কথা শুনে খাদিজা (রা) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে সান্তনা দান করে বললেন, আপনি অটল থাকুন। 'আমি বিশ্বাস করি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। '(রাসূলুল্লাহর জীবন চরিত- পৃষ্ঠা ১৭০)

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নবুয়্যতের প্রতি খাদিজা (রা) এ দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা ছিল একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ দীর্ঘ দশ বছর থেকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিণী হিসেবে জীবনযাপন করেছেন। এই দীর্ঘ সময় রাসূলুল্লাহর সাহচর্যে থেকে খাদিজা (রা)-এর নিকট এ সত্য প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, সততা, আমানতদারিতা, তাকওয়া ও ন্যায়নিষ্ঠতার মতো গুণাবলি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মধ্যে পুরোপুরি রয়েছে। তিনি অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে গভীর চিন্তা ও ধ্যানে নিমগ্ন দেখতে পেয়েছেন। তার এ কথা জানা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর চিন্তা-গবেষণার পরম লক্ষ্য ছিল সত্যের সন্ধান। তিনি পৌত্তলিক তথা বাতিল ধ্যানধারণাকে বিন্দুমাত্রও গুরুত্ব প্রদান করেন না। হিরা গুহা থেকে প্রত্যাবর্তন ও অহীর সূচনা লগ্নে খাদিজা (রা) এ বিষয়টি পুরোপুরি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

এক পর্যায়ে খাদিজা (রা) ফেরেশতাকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। একবার ফেরেশতা আসলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিজা (রা)-কে প্রথমে

বামদিকে, এরপর ডানদিকে এবং সর্বশেষ সামনে বসিয়ে রাখেন। এই তিন অবস্থায়ই ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট অবস্থান করেন। খাদিজা (রা)-এর মনে প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্ম নেয় যে, যিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে অহী নিয়ে আসেন, তিনি ফেরেশতা; শয়তান নন।

আল-কুরআনে আল্লাহ পাক ইবরাহীম (আ)-এর দাওয়াতের পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেছেন-

'বলো আমার নামায, আমার ইবাদতের সব অনুষ্ঠান, আমার জীবন-মৃত্যু সবকিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, যার কোনো শরীক নেই। এরই নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে এবং সবার আগে আমিই আনুগত্যের শির নতকারী।' (সুরা আনআম - ১৬৩)

আল কুরআনের এ আয়াতেরই পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছিল খাদিজা (রা)- এর জীবনে। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ স্বাদ-এর আনীত রিসালাতকে সর্বপ্রথম গ্রহণ করার সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেন।

ইবনুল আছীর বলেন-

(ّخديجة أَوَّلُ خَلْقِ اللهِ أَسْلَمَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، لَمْ يَتَقَدَّمُهَا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَة) 'এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মার ইজমা হয়েছে যে, খাদিজা (রা) আল্লাহর সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান হয়েছেন। তার পূর্বে কোনো পুরুষ বা নারী ইসলাম গ্রহণ করেননি। '(ইবনুল আছীর)

যুহরী, কাতাদা, মূসা ইবন উকবা, ইবন ইসহাক, আল ওয়াকিদী ও সাঈদ ইবন ইয়াহইয়া বলেছেন-

(أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِالله وَرَسُولِهِ : خديجة، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم) 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর সর্বপ্রথম ঈমান আনেন খাদিজা, আবু বকর ও আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)।'

হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সা বলেছেন-

'আল্লাহ ও মুহাম্মদের ওপর ঈমান আনার ব্যাপারে খাদিজা (রা) বিশ্বের সকল নারীর অগ্রবর্তিনী। ' (আল হাকীম)

প্রথম সালাত আদায়কারিণী:

নামায ফরজ হওয়ার হুকুম যখন নাযিল হয়নি, তখন থেকেই খাদিজা (রা) ঘরের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে নামায আদায় করতেন। ইবন ইসহাক উল্লেখ করেছেন, একদিন আলী (রা) দেখতে পেলেন, তারা দুজন অর্থাৎ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খাদিজা (রা) নামায আদায় করছেন। খাদিজা (রা) তখন নতুন দ্বীনের দাওয়াত আলীর কাছে পেশ করলেন এবং এ কথা কাউকে বলতে নিষেধ করলেন। এ বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে সর্বপ্রথম খাদিজা (রা) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে নামায আদায়ের গৌরব অর্জন করেন।

আফিফ আল-কিন্দি নামক এক ব্যক্তি কিছু কেনাকাটার জন্য মক্কায় এসেছিলেন। একদিন সকালে লক্ষ করলেন, এক যুবক কাবার কাছে এসে আসমানের দিকে তাকালো। তারপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালো। একজন কিশোর এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর এলো এক মহিলা। সেও তাদের দুজনের পিছনে দাঁড়ালো। তারা নামায শেষ করে চলে গেল। দৃশ্যটি আফিফ আল-কিন্দি দেখলেন। আব্বাসকে তিনি বললেন, 'বড় রকমের কোনো একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে।' আব্বাস বললেন, 'হ্যাঁ।' তিনি আরো বললেন, 'এ নওজোয়ান আমার ভাতিজা মুহাম্মদ। কিশোরটি আমার আরেক ভাতিজা আলী এবং মহিলাটি মুহাম্মদের স্ত্রী। আমার জানা মতে দুনিয়ায় তারা তিনজনই মাত্র এই নতুন ধর্মের অনুসারী। '(ইবন সাদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১০-১১)
খাদিজা (রা) নবুয়্যতে মুহাম্মদীর ওপর প্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারিণী এবং তার সাথে প্রথম সালাত আদায়কারিণীই শুধু নন, সেই ঘোর দুর্দিনে ইসলামের জন্য তিনি যে শক্তি যুগিয়েছেন, চিরদিন তা অম্লান হয়ে থাকবে। ইসলামের সূচনালগ্নে প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উৎসাহ- অনুপ্রেরণার উৎস এবং তার বন্ধু, সহযোগী, সহকর্মী, পরামর্শদাত্রী। তার এই আন্তরিকতা ও জীবন উৎসর্গের কারণেই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতদিন খাদিজা (রা) জীবিত ছিলেন ততদিন দ্বিতীয় বিয়ে করেননি এবং খাদিজা (রা)-এর ইন্তেকালের পরও যতদিন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত ছিলেন, ততদিন তাকে ভুলতে পারেননি।

২য় পরিচ্ছেদ : “শিশুমনে ঈমানের ভীত স্থাপনকারী হলো নারী!

- **আনাস বিন মালিক (রাঃ)-এর মা**

মুলাইকা বিনতে মিলহান। তার উপাধি ছিল গুমাইছা বা রুমাইছা। তবে তিনি উম্মু সুলাইম নামে প্রসিদ্ধ।

কোন মা যদি উপহার হিসাবে নিজ সন্তানকে নিয়ে গৌরব করতে চান, মুসলিম উম্মাহর উপর নিজ সন্তানকে নিয়ে গর্ব করতে চান, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গৃহের অংশীজন হিসাবে মুসলিম উম্মাহর উপর ফখর করতে চান তবে সবদিক দিয়েই আনাস বিন মালিক (রাঃ)-এর মায়ের সে অধিকার রয়েছে। আনাস (রাঃ)-এর মা তাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খাদেম হিসাবে তাঁর হাতে সমর্পণ করেছিলেন। এ খেদমতের সুযোগ লাভ যেমন আনাস (রাঃ)-এর জন্য ছিল শ্রেষ্ঠ উপহার তেমনি গোটা মুসলিম জাতির জন্যও তা শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় পদার্পণ করেন তখন আমার বয়স ছিল আট বছর। আমার মা আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলেন। তিনি তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনছারদের এমন কোন নারী-পুরুষ নেই যে আপনাকে কোন না কোন উপঢৌকন দেয়নি। আমার পক্ষে আপনাকে উপঢৌকন দেওয়ার সামর্থ্য নেই, কেবল আমার এই পুত্র ছাড়া। আপনি তাকে গ্রহণ করুন, সে আপনার চাহিদা মতো আপনার খেদমত করবে। (*আবু ইয়ালা, ৩৬২৪।)*

উম্মু সুলাইম ছিলেন একজন ধৈর্যশীলা মহিলা। সে ধৈর্য ছিল বড়ই বরকতময়। তার প্রজ্ঞাও ছিল উঁচু পর্যায়ের। কিছু ছহীহ বর্ণনায় এসেছে, আনাস (রাঃ)-এর বয়স দশ বছর না হ’তেই তার মা তাকে লেখাপড়া শিক্ষা দেন এবং ভালোভাবে লেখাপড়া রপ্ত না করা অবধি তিনি তাকে নবী করীম (ছাঃ)-এর হাতে সোপর্দ করেননি।।

এই মহিয়সী রমণীর বাড়িতে নবী করীম (ছাঃ) যখনই পদার্পণ করতেন তখনই তিনি তাঁর জন্য আগে থেকে প্রস্তুতকৃত কোন না কোন উপহার দিতেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে হাদীছ মুখস্থ রাখার দিক দিয়ে আনাস (রাঃ) এক উঁচু আসনের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহর রাসূল থেকে অধিক সংখ্যায় হাদীছ বর্ণনা ও মুখস্থ রাখার ক্ষেত্রে আবূ হুরায়রা ও ইবনু ওমরের পরেই তার স্থান। তার বর্ণিত

হাদীছ সংখ্যা ২২৮৬। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম সমন্বিতভাবে বর্ণনা করেছেন ১৮০টি হাদীছ। বুখারী এককভাবে ৮০ ও মুসলিম এককভাবে ৯০টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

- **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর মা**

'আমার বয়স যখন দশ তখন আমার মা আমাকে কুরআনের হাফেয করে গড়ে তোলেন। ফজর ছালাতের আগেই তিনি আমাকে জাগিয়ে দিতেন। বাগদাদের শীতের রাতগুলোতে তিনি আমার জন্য পানি গরম করে রাখতেন, আমার পোশাক পরিয়ে দিতেন। তারপর নিজের উড়না ও হিজাব পরে আমাকে সাথে করে মসজিদে নিয়ে যেতেন। মসজিদ ছিল আমাদের বাড়ি থেকে দূরে, আর রাস্তা থাকত অন্ধকার। সেজন্য তিনি প্রতিনিয়ত আমার সাথে এভাবে যাতায়াত করতেন'। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) মায়ের প্রসঙ্গে তার অভিব্যক্তি এভাবেই প্রকাশ করতেন।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর মায়ের নাম ছাফিয়া বিনতে মায়মূনা বিনতে আব্দুল মালেক।তার পিতার নাম মুহাম্মাদ বিন হাম্বল (রহঃ)। তিনি মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে যৌবনকালেই মৃত্যুবরণ করেন। ইমাম ছাহেবের মায়ের বয়স তখন ত্রিশের কম। তা সত্ত্বেও তিনি আর বিবাহে আগ্রহ প্রকাশ করেননি। পুত্রকে স্নেহ ও মায়া-মমতা দিয়ে বড় করে তোলার আকাঙ্ক্ষাই তাঁর মনে বড় হয়ে দেখা দেয়।

ফলশ্রুতিতে তিনি মুমিনদের দুনিয়ায় তাওহীদবাদীদের বিশ্বে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ইমাম হিসাবে তার ছেলে আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে উপহার দিয়ে গেছেন। আর আল্লাহ ছিলেন তার ইচ্ছার পিছনে তাওফীক্বদাতা।

সেই শৈশবে মা তার মধ্যে ঈমানের বীজ বপণ করেছিলেন, যাতে উত্তরকালে তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ইমাম হিসাবে বরিত হ'তে পারেন। তার ছেলে যেমন শারঈ ইলমে পারদর্শী হবে; তেমনি হবে সংসারে অনাসক্ত, আল্লাহভীরু মানুষ, মা হিসাবে তিনি তেমনটাই চাইতেন। কুরআন, হাদীছ ও ফিক্বহ শারঈ ইলমের শিরোভূষণ। আল্লাহভক্তি ও সংসারে অনাসক্তি কেবল তখনই মাহাত্ম্যের উঁচু মাকামে উঠতে পারে যখন তা কুরআন, হাদীছ ও ফিক্বাহের বিদ্যায় সুশোভিত হবে। এমন অবস্থাতেই কেবল বান্দা বাছিরত সহকারে জেনে-বুঝে আল্লাহর ইবাদত করতে পারে। এমন হ'লেই সে রাসূল (ছাঃ)-এর বিধিবদ্ধ শরী'আত মেনে জীবন কাটাতে পারে এবং দ্বীনের মধ্যে বিদ'আতের অনুপ্রবেশ ঘটানো থেকে আত্মরক্ষা করতে

পারে। বিদ্যার সাথে কার্যকর অভিজ্ঞতাও বড় প্রয়োজন। তার মায়ের সেদিকেও সমান নযর ছিল।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) যখন ১৬ বছর বয়সে পদার্পণ করেন তখন তার মা তাকে ইলমে হাদীছ অন্বেষণের উদ্দেশ্যে সফর করতে নির্দেশ দেন। যেখানে অধিকাংশ মা তাদের একমাত্র পুত্রধনকে নিজের আঁচলতলে আবদ্ধ রাখেন, ঘরের বাইরে যেতে দেন না, সেখানে এই মা তার একমাত্র পুত্রধনকে নিজের কাছে আটকে রাখেননি এবং ছেলের দৃঢ় ইচ্ছাকে তিনি থামিয়ে দেননি। তিনি বরং বিষয়টি আল্লাহর নিকট ন্যস্ত করেছেন এবং বিদ্যা অন্বেষণে ইখলাছ ও তাক্বওয়া অবলম্বনের জন্য ছেলেকে অছিয়ত করছেন।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) যাতে নিশ্চিন্তে খোলা মনে বিদ্যা অর্জন করতে পারেন সেজন্য তার মা অনেক ব্যয় করতেন এবং ছেলে যাতে আরামে লেখাপড়া করতে পারে সেজন্য যা কিছু যোগান দেওয়া দরকার সন্তুষ্ট চিত্তে তার ব্যবস্থা করতেন। আমরা যখন জানতে পারি যে, ইমাম আহমাদ (রহঃ) চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বে বিয়ে করেননি তখন বুঝতে পারি যে, শিক্ষার প্রতি তার মায়ের অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান হেতুই তা বিলম্বিত হয়েছিল।

ইমাম আহমাদের পিতা বাগদাদে তাদের জন্য দু'টি বাড়ি রেখে গিয়েছিলেন। তার একটিতে তারা বাস করতেন। আর দ্বিতীয়টি থেকে খুব সামান্য ভাড়া পেতেন। তাদের অন্য কোন আয়ের পথ ছিল না। ফলে প্রথম জীবনে ইমাম ছাহেবকে কঠিন অভাবের মোকাবেলা করতে হয়েছে। অভাবের মধ্যে তিনি প্রতিপালিত হয়েছেন, অভাবের মধ্য দিয়ে তিনি শিক্ষা লাভ করেছেন এবং এই অভাবকে সঙ্গে করে বিদ্যা ও বোধযোগে সংসারের প্রতি অনাসক্তি দেখিয়েছেন। তার শিক্ষক শাফেঈ (রহঃ) যেমন গাযায় জন্মগ্রহণ করেছেন, মক্কায় বেড়ে উঠেছেন তেমনি আহমাদ (রহঃ) বাগদাদে জন্মেছেন এবং বাগদাদে বেড়ে উঠেছেন। এক পর্যায়ে যখন তিনি কুরআন হেফয শেষ করেন এবং ভাষা শিক্ষা সম্পন্ন করেন তখন সরকারী কার্যালয়ে প্রবেশ করেন। সেখানে তার যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল লেখালেখির অনুশীলন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, যখন আমি ছোট শিশু তখন থেকে বিভিন্ন মক্তবে যাতায়াত করতাম, তারপর বিভিন্ন অফিসে ঘোরাফেরা করতাম, তখন আমার বয়স ছিল চৌদ্দ।

তারপর থেকে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বাগদাদের শায়খদের নিকট থেকে হাদীছ অন্বেষণ ও সংগ্রহ শুরু করেন। যার থেকে তিনি প্রথম হাদীছ লিখেন তার নাম ছিল

আবু ইউসুফ। ইমাম মহোদয় বলেন, আমি যখন হাদীছ অন্বেষণ শুরু করি তখন আমার বয়স ষোল বছর। আমার শিক্ষক হাশিম যখন মারা যান তখন আমার বয়স বিশ বছর। হাশিম থেকে আমি প্রথম হাদীছ শুনি ১৯৯ হিজরীতে।

তারপর ইমাম আহমাদ (রহঃ) হাদীছ অন্বেষণে কূফা, বছরা, মক্কা, মদীনা, ইয়ামন, শাম ও জাযিরা সফর করেন এবং প্রতিটি শহরের আলেমদের থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেন।

এই নেককার পুত্র ও মহান ইমামের জন্য ঐ মহীয়সী মা যথেষ্ট। তেমনি মায়ের জন্য এটা যথেষ্ট যে, তিনি মুমিনদের দুনিয়ায় তাওহীদবাদীদের বিশ্বে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ইমাম হিসাবে তার ছেলে আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে উপহার দিয়ে গেছেন।

মা ও ছেলের উপর আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট থাকুন এবং পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে তাদের উপর সালাম বর্ষণ অব্যাহত রাখুন।

- **ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মা**

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মায়ের কীর্তি ছেলের কীর্তির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) ১৯৪ হিজরীতে বুখারা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র মুহাম্মাদের উপর পিতা ইসমাঈলের যিন্দেগীর ছায়া দীর্ঘায়িত হয়নি। তিনি যখন দুনিয়া ছেড়ে যান তখন ছেলের বয়স সবেমাত্র কয়েক বছর হয়েছিল।

পিতার মৃত্যুর পর ইমাম বুখারী (রহঃ) ইয়াতীম হিসাবে তার মায়ের কোলে লালিত-পালিত হন। তিনি তার তারবিয়াত ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। ফলে মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি কুরআন হেফয সম্পন্ন করেন।

ঐতিহাসিকগণ শিশুকালে ইমাম বুখারীর জীবনে এক বিস্ময়কর ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। একবার রোগাক্রান্ত হওয়ার দরুন তার দু'চোখের জ্যোতি নিভে গিয়েছিল। তিনি চোখে দেখতে পেতেন না। মায়ের মন এতে বড়ই ব্যথিত হয়। ছেলের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার জন্য তিনি আল্লাহর নিকটে বেশী বেশী সকাতর কান্নাকাটি ও দো'আ-খায়ের করতে থাকেন। একদিন স্বপ্নে তিনি ইব্রাহীম খলীল (আঃ)-কে দেখতে পান। তিনি তাকে ডেকে বললেন, হে মেয়ে! তোমার বেশী বেশী কান্নাকাটি বা দো'আর ফলে আল্লাহ তোমার ছেলের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। এ কাহিনীর

বর্ণনাকারী আহমাদ বিন ফযল বলখী বলেন, আমরা সকাল বেলা উঠে দেখি, মহান আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

ইমাম বুখারীর দৃষ্টিশক্তি লোপ এবং মায়ের কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহর নিকট দো'আর মাধ্যমে তা ফিরে পাওয়া ঐ মায়ের কারামতের প্রকৃষ্ট দলীল। যে কারো উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার পথে দো'আ যে শক্তিশালী অস্ত্র সে প্রমাণও এ ঘটনার মধ্যে রয়েছে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) যখন কুরআন হেফয শেষ করেন তখন তার বয়স ছিল সাত বছর। আর যখন সুন্নাহ বা হাদীছ অধ্যয়ন শুরু করেন তখন তার বয়স ছিল দশের নীচে। যখন হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের জন্য নিজ শহর ও এলাকা ত্যাগ করেন তখন তার বয়স ছিল ষোল বছর। এর দু'বছর পর তিনি প্রথম গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অর্থাৎ তখন তার বয়স ছিল আঠার বছর।।

আল্লাহ তা'আলা করুণা বর্ষণ করুন ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারীর উপর।

- **ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর মা**

ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর মায়ের নাম ফাতেমা বিনতে আব্দুল্লাহ।

ইমাম শাফেঈ যখন মাতৃগর্ভে তখন তার মা একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন বলে অনেকে উল্লেখ করেছেন। মক্কায় তার সন্তানের ভবিষ্যৎ সুন্দর হবে বলে স্বপ্নে তাকে জানানো হয়েছিল। স্বপ্নের এ কথা সত্য হ'লে তা হবে আদব ও ইলমের পর ইমাম শাফেঈর মর্যাদাশালী হওয়ার তৃতীয় কারণ।

কুরআন হিফযের প্রতি তার মা প্রথমেই গুরুত্ব দেন। ফলে মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। তারপর তিনি হাদীছ শেখায় মনোনিবেশ করেন। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি ইমাম মালেক সংকলিত মু'আত্তা গ্রন্থ মুখস্থ করে নেন। তারপর তিনি মক্কায় ইলম অন্বেষণে মশগূল হন এবং শারঈ বিদ্যায় এতটাই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন যে বিশ বছর না হ'তে তিনি ফৎওয়া দানের অনুমতি লাভ করেন। তার এ অর্জনের পিছনে মহীয়সী মায়ের অবদান অনস্বীকার্য।

ইমাম শাফেঈর মায়ের পক্ষে যতটা সম্ভব হয়েছে ছেলেকে তিনি এক অনুকরণীয় শিক্ষাদান করে গেছেন। এই মা জননীর উপর মহান আল্লাহ তা'আলার রহমতের ভান্ডার অবারিত হোক। তিনি তার জীবনকে স্রেফ ছেলের মধ্যে সীমিত রেখেছিলেন।।

৩য় পরিচ্ছেদ: দ্বীনের খেদমতে নারীদের প্রসারিত বাহু;

ইসলাম বিশ্বজনীন এক চিরন্তন ও শাশ্বত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামে রয়েছে নারীর সম্মান, মর্যাদা ও সকল অধিকারের স্বীকৃতি।

মানবসভ্যতার বিকাশে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো।’ (সুরা: হুজরাত, আয়াত: ১৩)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, ‘পুরুষ ও নারীদের মধ্যে যে ঈমানের সঙ্গে ভালো কাজ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণ অবিচার করা হবে না।’ (সুরা: নিসা, আয়াত: ১২৪)

ইসলাম প্রচারে পুরুষদের মতো নারীদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। দ্বীন তথা ইসলামের প্রচার-প্রসারে নারীদের যথাযথ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে মানবজীবনে পূর্ণ দ্বীন বাস্তবায়ন এবং ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা অর্জন সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘নিশ্চয়ই নারীরা হলো পুরুষদের সহোদরা।’

পবিত্র কোরআনে এমন একাধিক নারীর উল্লেখ রয়েছে, যারা মানব ইতিহাসের নানা অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘(বহু) পুরুষ নারীর সমতুল্য নয়।’ (সুরা: আলে-ইমরান, আয়াত: ৩৬)

এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবিদের মধ্যে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও ছিল। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর জীবন এক মহিমান্বিত জীবন। ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইতিহাস সাক্ষী, বহু নারী আল্লাহর রাস্তায় মেহনতের মাধ্যমে অলংকৃত করে গেছেন এই দ্বীনকে। যুগশ্রেষ্ঠ সেই নারীদের সংখ্যা কিন্তু কম নয়।

নারী সাহাবিরা দৃঢ় মনোবল, ধৈর্য, আগ্রহ ও অসীম সাহসিকতার বলে ইসলাম ধর্মের খেদমতে অপূর্ব দৃঢ়তার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, যা ইতিহাসে বিরল।

ঐতিহাসিক মহীয়সী নারীরা হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন রক্ষার্থে প্রাণপণ যুদ্ধ করে শত্রুদের মোকাবিলা করেছিলেন।

ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা। উম্মু আম্মারা বলেন, ওহোদ যুদ্ধের সময় আমি দিনের প্রথম ভাগে ওহোদ প্রান্তর পানে বের হ'লাম। লোকেরা কে কি করছে তা আমি খেয়াল করছিলাম। আমার সাথে ছিল পানি ভর্তি একটা পাত্র। যেতে যেতে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে পৌঁছলাম। তিনি তখন ছাহাবীদের মাঝে অবস্থান করছিলেন। বিজয় তখন ছিল মুসলিমদের পক্ষে। তারপর মুসলিম বাহিনী যখন পরাজয়ের মুখোমুখি হ'ল তখন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ঘিরে দাঁড়ালাম এবং সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হ'লাম। তলোয়ার হাতে আমি তাঁর উপর আগত আক্রমণ ক্রমাগত প্রতিহত করছিলাম, আর তীর ছুঁড়ছিলাম। একপর্যায়ে আমি আহত হই। বর্ণনাকারী জামিলা বিনতে সা'দ বিন রবী' বলেন, আমি তার কাঁধে একটা ক্ষত দেখেছি, যা ছিল গভীর এবং ভেতরটা ফাঁফাঁ।

উম্মু আম্মারা বলেন, যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রেখে লোকেরা পালিয়ে গেল। দশ জনের বেশী লোক তখন তাঁর আশেপাশে ছিল না। আমার দুই পুত্র, আমার স্বামী এবং আমি ছিলাম তাঁর সামনে। আমরা তাঁর উপর আপতিত আক্রমণ প্রতিহত করছিলাম। অথচ লোকেরা পরাস্ত হয়ে ময়দান ছাড়তে ছোটাছুটি করছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দেখলেন, আমার হাতে কোন ঢাল নেই। তিনি একজনকে ফেরার হ'তে দেখলেন, যার হাতে ঢাল ছিল। তিনি ঢালওয়ালাকে বললেন, যে যুদ্ধ করছে তোমার ঢালটা তার কাছে ফেলে দাও। সে ঢাল ফেলে দিলে আমি তা হাতে নিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সেই ঢালের মাধ্যমে সুরক্ষা করে যাচ্ছিলাম।

এদিনে উম্মু আম্মারার দেহে ১৩টি যখম লেগেছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে প্রশংসা করে বলেন, 'এদিন নুসাইবা বিন কা'বের ভূমিকা অমুক অমুকের ভূমিকা থেকে শ্রেয় ছিল'।।

বুখারি শরিফে বর্ণিত হয়েছে।

'নারীদের স্বভাব হলো, তারা একে অপরকে সহযোগিতা করে থাকে।।(সহিহ বুখারী-৫৮২৫)

৪র্থ পরিচ্ছেদ: দ্বীনের প্রথম শহীদ -নারী!

সুমাইয়া (রা) সত্যের দুশমনদের হাতের প্রথম শিকার। স্বামী ইয়াসির পুত্র আম্মারকে সঙ্গে নিয়ে এককালের কৃতদাসী সুমাইয়া ইসলাম কবুল করেছিলেন। এ তো কম স্পর্ধা নয়। সারা আরব যাকে শত্রুজ্ঞান করে প্রায় এক ঘরে করে রেখেছে, তার দলেই তিনি স্বামী-পুত্র নিয়ে যোগদান করলেন। শুরু হলো নির্যাতন ইয়াসির পরিবারের ওপর। নির্যাতন ভোগ করে স্বামী ইয়াসির মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তাতেও তিনি বিন্দুমাত্র দমিত হলেন না। তাকে তপ্ত বালুর ওপর শুইয়ে রাখা হতো। মাথার ওপর প্রদীপ্ত সূর্য এবং নিচে তপ্ত বালু রাশির মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। সন্ধ্যাবেলা তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনা হতো। নতুন আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করার বিষয়টি আরো চিন্তা-ভাবনা করে দেখার জন্য রাতের বেলা তাকে ফুরসত দেওয়া হতো। পরদিন তার কাছে এসে তাদের আশা ভঙ্গ হতো। ক্রোধে ফেটে পড়ত অবিশ্বাসীদের দল। কষ্টের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নির্যাতন দেখে খুব কষ্ট পেতেন।

জাবির (রা) বলেন, একদিন মুশরিকরা যখন আম্মার ও তার পরিবারবর্গকে শাস্তি দিচ্ছিল, তখন সেই পথ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি তাদের অবস্থা দেখে বলেন, হে ইয়াসিরের পরিবার-পরিজন। তোমাদের জন্য সুসংবাদ। তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি।

আবদুল্লাহ ইবন জাফর বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সেই অবস্থায় দেখে বলেন, 'হে ইয়াসিরের পরিবারবর্গ। ধৈর্য ধরো। হে ইয়াসিরের পরিবারবর্গ। ধৈর্য ধরো। তোমাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত রয়েছে।' উসমান (রা) বলেন, একদিন আমি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আল-বাতহা উপত্যকায় হাঁটছিলাম। তখন দেখতে পেলাম, আম্মার ও তার পিতা-মাতার ওপর উত্তপ্ত রোদে নির্যাতন চালানো হচ্ছে। আম্মারের পিতা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে দেখে বলে ওঠেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাহ ! কালচক্র এরকম?' রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে ইয়াসিরের পরিবার-পরিজন। ধৈর্য ধরো। হে আল্লাহ, ইয়াসিরের পরিবারবর্গকে ক্ষমা করুন।'

ইসলামের প্রথম শহীদ

সারাদিন শাস্তি ভোগ করার পর সন্ধ্যায় তারা মুক্তি পেতেন। শাস্তি ভোগ করে সুমাইয়া (রা) প্রতিদিনের মতো একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলেন। পাষণ্ড আবু জাহেল তাকে অশালীন ভাষায় গালি দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তার পশুত্বের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যায়। সে সুমাইয়ার দিকে বর্ষা ছুড়ে মারে এবং সেটি তার যৌনাঙ্গে গিয়ে বিদ্ধ হয় এবং তাতেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

মায়ের এমন অসহায় মৃত্যুবরণে ছেলে আম্মারের দুঃখের অন্ত ছিল না। তিনি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন তো যুলুম-অত্যাচার মাত্রাছাড়া রূপ নিয়েছে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দিলেন। তারপর বললেন-

'হে আল্লাহ! তুমি ইয়াসির পরিবারের কাউকে জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দিও না।'

সুমাইয়া (রা)-এর শাহাদাতের ঘটনাটি হিজরতের পূর্বের। এ কারণে তিনিই হলেন ইসলামের প্রথম শহীদ। মুজাহিদ (রহ) বলেন, 'ইসলামের প্রথম শহীদ হলেন, আম্মার (রা)-এর মা সুমাইয়া।' বদর যুদ্ধে আবু জাহেল নিহত হলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মারকে বললেন, 'আল্লাহ তোমার মায়ের ঘাতককে হত্যা করেছেন।' রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বিশ্বস্ত কর্মী সুমাইয়া (রা) ইসলামী সমাজের গোড়াপত্তনের সংগ্রামে যেভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় বিরল।

৫ম পরিচ্ছেদ: দ্বীন প্রচারে – নারী:

নারীদের মধ্যে যারা ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন, তাঁরা নিজেদের জ্ঞানকে প্রসারের জন্য নারী পুরুষ উভয়ের মাঝেই কাজ করেছেন।।

এসব সংখ্যা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকম ছিল, কিন্তু সংখ্যাটা ছিল অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ: আজ-জাহাবি, হাফিজ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ ইবনে নাজ্জারের (মৃত্যু: ৬৪৩ হি.) বিষয়ে ইবনে সাআতি থেকে বর্ণনা করেন- 'ইবনে নাজ্জারের ৩০০০ পুরুষ ও ৪০০ নারী শিক্ষক ছিলেন। 'সাহাবিদের মধ্যে যারা আয়িশা (রা.) থেকে হাদিস বর্ণনা করেন, তাঁরা হলেন-তাঁর পিতা আবু বকর, উমর ইবনে খাত্তাব, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবু হুরায়রা, আবু মুসা আল আশআরি, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, রাবিয়া বিনতে আমর আল জুরাসি, সাইব ইবনে ইয়াজিদ, আমর ইবনুল আস, জায়েদ ইবনে খালিদ আল জুহানি, আবদুল্লাহ ইবনে আমির ইবনে রাবিয়া, আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে নওফেল (রা.)-সহ আরও অনেকে।

রাসূল (সা.)-এর স্ত্রীগণ ছাড়া অন্য নারীগণের থেকেও সাহাবিগণ হাদিস বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানের জগতে প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব আলি ইবনে আবু তালিব রাসূল (সা.)- এর দাসী মাইমুনা (রা.) থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

আউন ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন-'আমরা উম্মে দারদার নিকট (তাঁর শিক্ষার আসরে) আসতাম এবং সেখানে আল্লাহকে স্মরণ করতাম।(আজ -জাহাবি , সিয়ারু আলামিন নুবালা)।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ: যুদ্ধে নারীর অবদান;

মুজাহিদা উম্মু আম্মারা (রাঃ)

তিনি আকাবার বায়‘আতের রাতে উপস্থিত ছিলেন। অংশ নিয়েছিলেন ওহোদ, হুদায়বিয়া, হুনাইন ও ইয়ামামার যুদ্ধে।

তিনি এমন মহিলা যার অন্তর ছিল আল্লাহর ভালবাসা ও তার নবীর মহববতে টইটুম্বুর।ওহোদ যুদ্ধের ঘটনা। উম্মু আম্মারা বলেন, ওহোদ যুদ্ধের সময় আমি দিনের প্রথম ভাগে ওহোদ প্রান্তর পানে বের হ’লাম। লোকেরা কে কি করছে তা আমি খেয়াল করছিলাম। আমার সাথে ছিল পানি ভর্তি একটা পাত্র। যেতে যেতে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে পৌঁছলাম। তিনি তখন ছাহাবীদের মাঝে অবস্থান করছিলেন। বিজয় তখন ছিল মুসলিমদের পক্ষে। তারপর মুসলিম বাহিনী যখন পরাজয়ের মুখোমুখি হ’ল তখন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ঘিরে দাঁড়ালাম এবং সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হ’লাম। তলোয়ার হাতে আমি তাঁর উপর আগত আক্রমণ ক্রমাগত প্রতিহত করছিলাম, আর তীর ছুঁড়ছিলাম। একপর্যায়ে আমি আহত হই। বর্ণনাকারী জামিলা বিনতে সা‘দ বিন রবী‘ বলেন, আমি তার কাঁধে একটা ক্ষত দেখেছি, যা ছিল গভীর এবং ভেতরটা ফাঁফাঁ।উম্মু আম্মারা বলেন, যুদ্ধক্ষেত্র হ’তে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রেখে লোকেরা পালিয়ে গেল। দশ জনের বেশী লোক তখন তাঁর আশেপাশে ছিল না। আমার দুই পুত্র, আমার স্বামী এবং আমি ছিলাম তাঁর সামনে। আমরা তাঁর উপর আপতিত আক্রমণ প্রতিহত করছিলাম। অথচ লোকেরা পরাস্ত হয়ে ময়দান ছাড়তে ছোটাছুটি করছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দেখলেন, আমার হাতে কোন ঢাল নেই। তিনি একজনকে ফেরার হ’তে দেখলেন, যার হাতে ঢাল ছিল। তিনি ঢালওয়ালাকে বললেন, যে যুদ্ধ করছে তোমার ঢালটা তার কাছে ফেলে দাও। সে ঢাল ফেলে দিলে আমি তা হাতে নিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সেই ঢালের মাধ্যমে সুরক্ষা করে যাচ্ছিলাম।

বিরোধী পক্ষের অশ্বারোহী বাহিনী আমাদের নিয়ে যাচ্ছেতাই করছিল। তারা যদি আমাদের মতো পদাতিক হ’ত তাহ’লে আল্লাহ চাহেন তো আমরাও তাদের মতো আঘাত হানতে পারতাম। এমন সময় এক অশ্বারোহী আমার উপর তলোয়ারের আঘাত হানে। আমি ঢাল দিয়ে তা প্রতিহত করি, ফলে তার তলোয়ার আমার উপর কোন ক্রিয়া করতে পারেনি। সে পালিয়ে যাচ্ছিল। তখন আমি তার ঘোড়ার গোড়ালি বরাবর

আঘাত হানি। সে আঘাতে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যায়। তখন নবী করীম (ছাঃ) ডেকে ডেকে বলতে লাগলেন, হে উম্মু আম্মারার ছেলে! তোমার মাকে সাহায্য করো, তোমার মাকে সাহায্য করো। ছেলে এসে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করে। ফলে আমি তাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে দেই। (*সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/২৭৯।)*

উম্মু আম্মারা (রাঃ) বলেন, হুনাইন যুদ্ধের দিন লোকেরা যখন পরাস্ত হয়ে দিগ্বিদিক পালিয়ে যাচ্ছিল তখন আমার হাতে ছিল ধারাল তলোয়ার। আমরা ছিলাম চারজন মহিলাঃ আমি, উম্মু সুলাইম, উম্মু সালীত ও উম্মুল হারিছ। উম্মু সুলাইম এ সময়ে গর্ভবতী ছিল। তাই সে ফিতা দিয়ে তার পেট বেঁধে নিয়েছিল। আমি তলোয়ারের খাপ খুলে ফেললাম এবং আনছারদের লক্ষ্য করে চীৎকার দিয়ে বলতে লাগলাম, এ কেমনতর আচরণ? তোমরা পালাচ্ছ কেন? এ সময় আমি উটের পিঠে আরোহী হাওয়াযিন গোত্রীয় জনৈক মুশরিককে দেখতে পেলাম। তার হাতে একটা পতাকা ছিল। সে তার উট নিয়ে মুসলিমদের পিছু ধাওয়া করার ইচ্ছা করছিল। আমি তার দিকে লক্ষ্য স্থির করলাম এবং উটের গোড়ালিতে তলোয়ারের আঘাত হানলাম। সে চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেল। আমি তার উপর হামলে পড়লাম এবং আঘাতের পর আঘাত হেনে তাকে হত্যা করলাম। আমি তার তলোয়ারটা নিয়ে নিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি তলোয়ারের খাপ ফেলে দিয়ে তার স্বরে ডাকছিলেন, হে সূরা বাক্বারার সাথীগণ! (*ওয়াকেদী, মাগাযী ৩/৯০৩।)*

শহীদ জননী খানসা (রাঃ):

ইসলামের ইতিহাসে খানসা সবচেয়ে প্রভাবশালী নারী কবি।।

তিনি পারস্যের জিহাদে অংশ নেন এবং কাদেসিয়ার মতো ভয়াবহ যুদ্ধে তিনি তার চার পুত্রসহ সরাসরি উপস্থিত ছিলেন। ময়দানে নামার আগে তিনি সবাইকে একত্র করে নিম্নের চিরস্মরণীয় কথাগুলো বলেন এবং তাদের অন্তরে ঈমানের স্ফুলিঙ্গ ও ইয়াক্বীনের নূর জ্বালিয়ে দেন।

খানসা (রাঃ) কাদেসিয়ার যুদ্ধে নারীদের সাথে অংশ নিয়েছিলেন। নারীদের কাজ ছিল সেনাদলের সেবা-যত্ন করা, খানা পাকানো, পানি পান করানো এবং তাদের নানা প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখা। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও নিহত সৈনিকদের মুসলিম সেনাদলের ডেরায় বয়ে আনার কাজও তারা করছিলেন।

এই যুদ্ধে খানসামা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহার চার ছেলে শাহাদাত বরণ করেন।

মহান আল্লাহ খানাসার উপর রহমত করুন। রহমত করুন তার চার ছেলের উপর।।

- সাফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব (রা)

তিনি কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধে তার সাহস ও দৃঢ়তা বিস্ময়ের দৃষ্টান্তে পরিণত হয়ে আছে।

খন্দক, মতান্তরে উহুদ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম মহিলাদের কবি হাসসান ইবন সাবিত (রা)-এর ফারে দুর্গে নিরাপত্তার জন্যে রেখে যান। এই ফারে দুর্গকে উতুম দুর্গও বলা হতো। তাদের সাথে হাসসানও ছিলেন এবং মহিলাদের মধ্যে সাফিয়্যা ছিলেন। একদিন তিনি এক ইহুদিকে দুর্গের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখেন। তিনি প্রমাদ গুনলেন, যদি সে মহিলাদের অবস্থান জেনে যায়, ভীষণ বিপদ আসতে পারে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাহিনীসহ তখন জিহাদের ময়দানে অবস্থান করছেন। সাফিয়্যা (রা) বিপদের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে হাসসানকে বললেন, এই ইহুদিকে হত্যা করো। তা না হলে সে আমাদের অবস্থানের কথা অন্য ইহুদিদেরকে জানিয়ে দেবে। হাসসান (রা) বললেন, 'আপনার জানা আছে, আমার নিকট এর কোনো প্রতিকার নেই। আমার যদি সেই সাহস থাকত, তাহলে আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথেই থাকতাম।' সাফিয়্যা তখন নিজেই তাঁবুর একটি খুঁটি হাতে নিয়ে ইহুদির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করেন। তারপর হাসসান (রা)-কে বলেন, 'যাও এবার তার সঙ্গের জিনিসগুলো নিয়ে এসো। যেহেতু আমি নারী আর সে পুরুষ, তাই এ কাজটি আমার দ্বারা হবে না। এ কাজটি তোমাকে করতে হবে।' হাসসান বলেন, ঐ জিনিসের প্রয়োজন নেই। '

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। সাফিয়্যা (রা) লোকটিকে হত্যার পর মাথা কেটে এনে হাসসানকে বলেন, ধরো, দুর্গের নিচে ইহুদিদের মধ্যে ফেলে এসো। তিনি বললেন, 'এ আমার কাজ নয়।' অতঃপর সাফিয়্যা (রা) নিজেই মাথাটি ইহুদিদের মধ্যে ছুঁড়ে মারেন। আর ভয়ে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তার সম্পর্কে ইবন কাছীর বলেছেন,

(َوكانت أَوَّلَ امْرَأَةٍ فَتَلَتْ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِين

'তিনিই প্রথম মহিলা, যে একজন মুশরিক পুরুষকে হত্যা করেছে।'

- উম্মু আতিয়্যা বিনত হারিস (রা)

উম্মু আতিয়্যা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে ৭টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর

সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তাদের পিছনে তাঁবুতে থেকে তাদের জন্য খাবার তৈরি করতাম। আহতদের ঔষধ পান করাতাম এবং রোগীদের সেবায় নিয়োজিত থাকতাম। খায়বার যুদ্ধে উম্মু আতিয়্যা (রা) বিশজন মহিলার একটি দলের সাথে জিহাদের নেকী লাভের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হন।।

এরকম অসংখ্য নারী সাহাবী, তাবেইন নারী এবং বহু যুগের বহু নারী রা তাদের জান মাল এবং রক্ত দিয়ে কখনো স্বামীর সাথে কখনো বা সন্তানের সাথে আবার কখনো বা দলবদ্ধ ভাবে অন্য নারীদের সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় বরণীয় হয়ে আছেন। আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন।

৭ম পরিচ্ছেদ: রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীর ভুমিকা

{وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ}

[Surah At-Tawbah: 71]

আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; তারাই, যাদেরকে আল্লাহ্‌ অচিরেই দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর রয়েছে শাসকের ভুল সংশোধনের বা শাসককে জবাবদিহি করার অধিকার। ওমর ইবনে খাত্তাবের (রা.) সময় একজন সাধারন নারী মোহরানা সংক্রন্ত বিষয়ে জনসম্মুখে ওমরের (রা.) সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল।। ওমর (রা.)-এর যুগে প্রখ্যাত আইনজ্ঞ শিফা বিনতে আবদুল্লাহকে আদালতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়া হয়। আলী (রা.)-এর যুগে আয়েশা (রা.)-এর ভূমিকা নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

রাজনীতির ক্ষেত্রে আরব জাহানে ইসলামের অনেক প্রতিভাবতী মহিলার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, যা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ। তাদের মধ্যে উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা অন্যতম। প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও ফারুকে আযম উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং তার সিদ্ধান্তকে অত্যাধিক গুরুত্ব দিতেন। শিফা বিনতে আব্দিল্লাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা এর সিদ্ধান্তকে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু অনুমোদন করতেন। তিনি মহিলা বিষয়ক কোনো কোনো সরকারি কাজের দায়িত্ব শিফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে দিতেন।

কুরআনের তাফসীর বর্ণনা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস বর্ণনায়, হাদীসের ব্যাখ্যায় সারা বিশ্বে মুসলিম জননীগণ বিশেষতঃ উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সমস্ত মহিলা সাহাবী রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-দের তুলনায় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।(*ইবনে সা'দ, ২য় খণ্ড*)

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ২২১০ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ৩৭৮ খানা হাদীস উম্মূল মু'মিনীন উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এ

ছাড়া উম্মে আতিয়া, আসমা বিনতে আবু বকর, উম্মে হানী এবং ফাতিমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমুখ মহিলা বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফিকহ বিদ্যায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কর্তৃক এত অধিক ফাতওয়া রয়েছে, যা একত্রিত করলে বৃহৎ গ্রন্থ হয়ে যেতে পারে।

অনুরূপ উম্মে সালমা কর্তৃক বর্ণিত ফাতওয়াসমূহও একখানা পুস্তিকার আকার পেতে পারে। ফারায়েয বিষয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ও অন্যান্য মহিলা সাহাবী হাদীস, ফিকহ, তাফসীর, ফারায়েয, কিরাআত ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তারা অনেকে কুরআনের হাফিযা ছিলেন।

রাজনৈতিক অবদান:

রাজনীতিতেও নারী সাহাবিগণ রেখেছেন বেশকিছু অবদান। শেফা বিনতে আবদুল্লাহ রা. রাজনীতি সম্পর্কে এতটাই চিন্তাশীল ছিলেন যে, উমর রা. প্রায়-ই তার ভূয়সী প্রশংসা করতেন এবং তার থেকে পরামর্শ নিতেন। উমর রা. কখনো কখনো বাজার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও দিতেন তার হাতে।

হিজরতের পূর্বে কুরাইশরা যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর ঘিরে ফেলতে চেয়েছিল, আবদুল মুত্তালিবের ভাতিজি রুকাইকা বিনতে আবু সাইফি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়েছিলেন এ দুরভিসন্ধির সংবাদ। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নবীজি আলি রা.-কে শয়নকক্ষে রেখে মদিনার পথ ধরেছিলেন।

রাজনীতিতে নারীদের মতামতকে এতটাই গুরুত্ব দেওয়া হতো যে, কোনো নারী রাষ্ট্রীয় কোনো শত্রুকে নিরাপত্তা দিলেও শাসক তা বহাল রাখতেন।

সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, মক্কা বিজয়ের সময় উম্মে হানি রা. এক মুশরিককে নিরাপত্তা দিলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ, আমরাও তাকে নিরাপত্তা দিলাম।' (সুনানে আবু দাউদ - ২৭৬৯),।

এছাড়াও যুগে যুগে বহু নারী সরাসরি রাষ্ট্রের শাসনকার্যেও জড়িত ছিলেন। এরকমই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সুলতানা রাজিয়া।

আল্লাহ যুগের সেই মহীয়সী নারীদের উচ্চ মাকাম দান করুন।

৮ম পরিচ্ছেদ: সমাজ সংস্কারে নারীর ভুমিকা

ইসলাম নারীকে মানবসভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং মৌলিক অধিকার ও সামাজিক মর্যাদায় পুরুষের সমান অংশীদার মনে করে। মানবসভ্যতার বিকাশে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো।' (সুরা : হুজরাত, আয়াত : ১৩)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'পুরুষ ও নারীদের মধ্যে যে ঈমানের সঙ্গে ভালো কাজ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণ অবিচার করা হবে না।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ১২৪)

পবিত্র কোরআনে এমন একাধিক নারীর উল্লেখ রয়েছে, যারা মানব ইতিহাসের নানা অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মহান আল্লাহ বলেছেন, '(বহু) পুরুষ নারীর সমতুল্য নয়।' (সুরা : আলে-ইমরান, আয়াত : ৩৬)।

খলিফা হারুনুর রশিদের স্ত্রী জোবায়দা এবং সুলতান মালিক শাহর স্ত্রী তুরকানের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো মুসলিম নারীর সমাজসেবার অনন্য উদাহরণ। একাদশ শতাব্দীতে মুসলিম নারীরা দামেস্কে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় ও ১২টি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যা নারীদের দ্বারাই পরিচালিত হতো। তা ছাড়া, স্পেনের আয়েশা বিনতে আহমদ ছিলেন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার, লুবনি ছিলেন ভাষাবিদ এবং রাবিয়া কাসিসাহ ছিলেন প্রসিদ্ধ বক্তা।

যুগে যুগে নারীরা সমাজ প্রচলিত নানা কুসংস্কারের গোড়ায় আঘাত করেছেন।তারা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছে দ্বীন ইসলামের দেখানো উজ্জ্বল আলোর দিকে।ফলে পরিবার,সমাজ রাষ্ট্রের ভিত মজবুত হয়েছে।মজবুত হয়েছে পারিবারিক বন্ধন,সামাজিক বন্ধন।

যুগে যুগে নারীদের দ্বীনি,ইলমি,সামাজিক,রাষ্ট্রীয় অবদানে সমাজে প্রোথিত কুসংস্কারের ঘাড়ে আঘাত লেগে চুরমার হয়েছে।

নারী সাহাবী, এবং পরবর্তী তাবেইন নারী তারও পরবর্তী মহীয়সী নারীদের এক্ষেত্রে ভুমিকা অনস্বীকার্য।

৯ম পরিচ্ছেদ: কুরআন ও সুন্নাহর পুনরুজ্জীবনে নারীর ভুমিকা

ইসলামি জ্ঞান তথা কিরাত, তাফসির, হাদিস, ফিকহ ও ফারায়েজশাস্ত্রে অনেক নারী সাহাবি উল্লেখযোগ্য পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। আম্মিজান আয়েশা রা.. হাফসা রা., উম্মে সালামা রা. এবং ওয়ারাকা রা. পূর্ণ কুরআনে কারিম হিফজ করেছিলেন। অপরদিকে হিন্দা বিনতে আসাদ, উম্মে হিশাম বিনতে হারিসা, রায়েতা বিনতে হাইয়ান এবং উম্মে সাদ বিনতে সাদ ইবনে রবি ছিলেন কুরআনের কিছু অংশের হাফেজ। উম্মে সাদ রা. তো কুরআনের পাঠদানও করতেন।

তাফসিরশাস্ত্রে ছিল আম্মিজান আয়েশা রা.-এর বিশেষ পাণ্ডিত্য। সহিহ বুখারির শেষ দিকে তার সূত্রে কুরআনের অনেক তাফসির বর্ণিত হয়েছে।

হাদিসেও ছিল নারী সাহাবিদের সরব উপস্থিতি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্যময়ী স্ত্রীদের সকলেই; বিশেষ করে আম্মিজান আয়েশা রা. ও উম্মে সালামা রা. এ শাস্ত্রে রেখেছেন অনন্য অবদান। আম্মিজান আয়েশা রা.-এর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২২১০ এবং উম্মে সালামা রা.-এর ৩৭৮। এ ছাড়াও উম্মে আতিয়া, আসমা বিনতে আবু বকর, উম্মে হানি এবং ফাতিমা বিনতে কায়স রা.-ও অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ফিকহে আম্মিজান আয়েশা রা. থেকে এত পরিমাণে ফাতাওয়া প্রদত্ত হয়েছে যে, সবগুলো একত্রিত করলে কয়েক খণ্ডের একটি বই রচিত হবে। উম্মে সালামা রা.-এর প্রদত্ত ফাতাওয়া দিয়ে রচিত হতে পারে ছোট একটি পুস্তিকা। আর সাইয়েদা সফিয়্যা, হাফসা, উম্মে হাবিবা, জুয়াইরিয়া, মাইমুনা, ফাতিমা, উম্মে শারিক, উম্মে আতিয়া, আসমা বিনতে আবু বকর, লায়লা বিনতে কায়েফ, খাওলা, উম্মে দারদা, আতেকা বিনতে জায়েদ, মাসহালাহ বিনতে সুহাইল, ফাতিমা বিনতে কায়স, জাইনাব বিনতে আবু সালামা, উম্মে আইমান, উম্মে ইউসুফ এবং উম্মে সালামা রা.-এর ফাতাওয়া একত্রিত করলে নিমিষেই তা নেবে সংক্ষিপ্ত একটি রিসালাহর রূপ।

ফারায়েজ তথা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার-সম্পর্কীয় শাস্ত্রে আম্মিজান আয়েশা রা.-এর বিশেষ দক্ষতা ছিল। অনেক বড় বড় সাহাবিগণও ফারায়েজ- সংক্রান্ত মাসআলা জানতে তার শরণাপন্ন হতেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময়ে এবং পরে অনেক মহিলা সাহাবী বিশেষ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ হাদীস বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা, হাফসা, উম্মে হাবীবা, মায়মূনা এবং উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রতিটি হাদীসের ছাত্র-ছাত্রীর নিকট স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যধারী হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে পরিচিত।

তাবি'য়ীদের যুগে ইবনু সিরীনের কন্যা হাফসা, উম্মে আবূ দারদা এবং 'আমরাহ্ বিনতে আব্দির রহমান গুরুত্বপূর্ণ হাদীসবেত্তা হিসেবে পরিচিত। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত হাদীসের অন্যতম বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন 'আমরাহ্ (র.)। তাঁর এক ছাত্র হচ্ছেন আবূ বকর ইবনে হাযম যিনি মদীনার প্রসিদ্ধ বিচারক ছিলেন, যিনি 'আমরাহ্ এর বর্ণিত সকল হাদীস লিখে ফেলার জন্য তৎকালীন খলীফা উমর ইবন আব্দিল আযীয (র.) কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন।

এদের পরে 'আবিদা, 'আবদা ইবন বিশর, উম্মে 'উমর, যয়নাব, নফিসা, খাদীজা, 'আবদা বিনতে 'আব্দুর রহমান এবং আরো অনেক নারী হাদীসের উপর বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন এবং তাঁরা হাদীস শিক্ষা দিতেন। এসব নারীরা বিভিন্ন পরিবেশ থেকেই এসেছেন। যেমন আবিদা একজন দাসী ছিলেন এবং এ অবস্থায় থেকেই তিনি মদীনার শিক্ষকদের নিকট হাদীস চর্চা করেন। এটা বলা হয় যে, তিনি দশ সহস্রাধিক হাদীসকে তাঁর শিক্ষকদের সাথে সম্পর্কিত করেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস চর্চায় নারীরা পুরুষের সাথে অংশগ্রহণ করে হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। এ ব্যাপারে পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, সকল গুরুত্বপূর্ণ হাদীস সংগ্রাহক অনেক নারী থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন। প্রতিটি প্রধান সংগ্রহে অনেক নারীর নাম রয়েছে।

এসব মহিলাদের কেউ কেউ হাদীসবিদ্যায় বেশ পাণ্ডিত্য অর্জন করে ঐ সময়ে প্রখ্যাত ছিলেন। তন্মধ্যে উম্মে হানী, মারিয়াম উল্লেখযোগ্য। যিনি তার শৈশবেই কুরআনের হাফেযা হয়ে যান এবং ইসলামের থিওলজি, আইন, ইতিহাস ও ব্যাকরণে বিশদ জ্ঞান লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি হাদীস শাস্ত্রে গভীরতা লাভের প্রত্যাশায় কায়রো ও মক্কা

শহরে গিয়ে ঐ সময়ের শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তাদের থেকে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি এতটাই দ্বীনদার ছিলেন যে, ন্যূনপক্ষে ১৩ বার হজ্জ সম্পাদন করেন। তিনি কায়রোর বিখ্যাত কলেজে ব্যাপক প্রোগ্রাম পরিচালনা করেন। অনেক স্কলারকে ‘ইজাযত্’ (তাঁর পক্ষ থেকে হাদীস প্রচারের অনুমতি) প্রদান করেন।

চতুর্থ অধ্যায়: নারীরা সমাজের অর্ধেক-বাকি অর্ধেকের জন্মদানকারী নারীরাই!

ইসলামের ইতিহাসে নারীর অবদান অনস্বীকার্য। ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হয়ে নারী আর্থসামাজিক উন্নয়নের অংশীদার হয়েছেন। হাজার বছরের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে নারীরা পর্দা-শালীনতা বজায় রেখে জ্ঞানচর্চা, সমাজসেবা ও অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছেন এবং পুরুষদের মতোই যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন।

নারীরা সন্তান জন্মদান হতে শুরু করে পরিবার গঠন,সমাজ গঠন এবং রাষ্ট্র গঠনের প্রতিটা সেক্টরে নারী এক অনবদ্য খুঁটির নাম যাদের ব্যতিত পরিবার, সমাজ রাষ্ট্র কল্পনাতীত।।

পরিবার,সমাজ,রাষ্ট্রে নারীর অসামান্য অবদানের পরিপ্রেক্ষিতেই বিখ্যাত মুসলিম স্কলার ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, “সমাজের অর্ধেকই নারী। বাকি অর্ধেকেরও জন্ম দেন নারী। তাই নারীরাই যেন পুরো সমাজ।”

সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী ছিলেন একজন নারী (খাদিজাতুল কোবরা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহা)।

নারী যদি পুরুষের পাশে থেকে মানসিক শক্তি না জুগাতো যুগে যুগে পুরুষরা এতো বড় বড় সভ্যতার সৃষ্টি করতে পারতেন না।সমাজ রাষ্ট্র হয়ে যেত স্তিমিত। সভ্যতা মুখ থুবড়ে পড়তো।

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,”তুমরা নারীর প্রতি সদাচার করবে কেননা তাদেরকে তোমাদের পাঁজরের হাড় হতে সৃষ্টি করা হয়েছে”

এই নারী শুধু পরিবার গঠনের মুল খুঁটিই নন,যুগে যুগে তারা দ্বীন প্রতিষ্ঠায়,কল্যানকর সমাজ এবং কল্যানকর রাষ্ট্র গঠনে পুরুষের পাশে থেকে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছেন।

তাই, নারীরা যেমন সংখ্যায় সমাজের অর্ধেক আবার এই নারীরাই বাকি অর্ধেকের জন্মদানকারী। তাই নারীরাই যেন পুরো সমাজের মতো।তাকে ছাড়া পরিবার,সমাজ রাষ্ট্র অস্তিত্ব হীন।

পরিশিষ্ট

যেই নারীরা একসময় পরিবার সমাজ এবং রাষ্ট্রের অতি মুল্যবান মুক্তা হয়ে দ্বীন ইসলামের দেখানো পথে ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছিলো, আজ সময়ের স্রোতে পশ্চিমা নগ্ন সভ্যতার ফাঁদে হারিয়ে যাচ্ছে। আধুনিকতার নামে নগ্নতা র হাওয়া তাদের মন ও মননে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে।

আজ তাদের সময়ের স্রোতে হারিয়ে যাওয়ার অন্যতম এক প্রধান কারন ইতিহাসের পুণ্যময়ি নারীদের দৃষ্টান্ত হতে তারা দুরে সরে গেছে।

আশা করবো,আমার এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রচেষ্টা টুকু আমাদের মা এবং বোনদের জাগ্রত করবে পুনরায় সেই হারানো জৌলুশ ফিরে পেতে।

ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরে লিখিত নারীদের কে সামনে রেখে আমরা মা বোন রাও এগিয়ে যাবো প্রশান্তির একমাত্র আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলামের দিকে ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহ আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন। যে সকল কিতাব,যে সকল মাসিক পত্রিকা, এবং ওয়েবসাইট হতে সাহায্য নিয়েছি আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দিন।

রেফারেন্স

(নিম্নোক্ত কিতাব,ওয়েবসাইট, মাসিক পত্রিকা হতে সাহায্য নেওয়া হয়েছে -

১) নারী সাহাবিদের জীবনকথা -(সিয়ারুস সাহাবায়ে সিরিজ -১১) সাইয়েদ সুলাইমান নদভী রহ.

২) আল মুহাদ্দিসাত (ড. মুহাম্মদ আকরাম নদভী)

৩) ইসলামী দাওয়াত ও রাসুলুল্লাহর (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলা সাহাবা(ড. রাশীদাহ)

৪) মানবসভ্যতা বিনির্মানে নারী (মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন)

৫) https://www.hadithbd.com/

৬) https://at-tahreek.com/